International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 09-13
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দক্ষিণ ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা : ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর

Dr. Barnali Bhowmick (Ghosh)
Principal Investigator for UGC Project
Asst. Prof., Dept. of Bengali, Dasaratha Deb Memorial College, Khowai, Tripura, India

Abstract

The Bengali dialect at state of Tripura situated in the North - East India is being diverse with that of the standard bengali language. The geographical contiguity of whole 845 km of the border of Tripura from North to South of Bangladesh and in the east with Assam has an impact on the Bengali dialect being used in Tripura.

This research paper focuses on the use and ascent of Bengali at district of South Tripura and its related sub-divisions .The field work being done for the preparation of this manuscript is a genuine work of its kind.

Keywords: South Tripura, Bengali dialect, Deviation

পূর্বভারতের অন্যতম পার্ব্বত্য সুন্দরী, ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে একাধারে রাজন্যবর্গের আর্য, হিন্দু, মুসলিম সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, পার্বত্য আদিবাসী ব্রাত্যজনের সমাজ সংস্কৃতি বর্তমান। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক মানচিত্রে, দেখা যায় রাজ্যের উত্তরে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা জেলার উত্তরাংশ; দক্ষিণে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম; পশ্চিমে কুমিল্লা জেলা ও পূর্বে আসাম বর্তমান। পূর্বাংশ ব্যতীত তিনদিকই বাংলাদেশের জেলাগুলি ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যকে ঘিরে রেখেছে। প্রায় ৮৪৫ কি.মি. আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকলেও, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মৌখিক বাংলাভাষায় আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় যে, পশ্চিম ত্রিপুরা-আগরতলা, খোয়াই, সোনামুড়া; উত্তর ত্রিপুরা-কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর; দক্ষিণ ত্রিপুরা-উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম মহকুমা আঞ্চলগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক উপভাষাগত বৈচিত্র্যতা রয়েছে। সমাজভাষা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণে, তথ্যভিত্তিক সংগঠনরীতির মানদণ্ডে মানুষের বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, জীবিকা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শহরে-গ্রাম্য অবস্থান সূচকে উপভাষাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রসমীক্ষা-তথ্যপ্রদান তাই গুরুত্ব-তাৎপর্যপূর্ণ, অভিনব-মৌলিক। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণে, একাধিক সংগঠন রীতির মানদণ্ডে দক্ষিণ ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার বৈচিত্র্যকে তুলে ধরাই প্রবন্ধটির মূল আলোচ্য বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধটি সম্পূর্ণই ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর, তবে প্রয়োজনে তথ্য গ্রহণও করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভাবনার সাথে বিজড়িত গ্রন্থপঞ্জী থেকে। তাই, প্রচলিত আঞ্চলিক বাংলাভাষার নমুনাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। ফলে, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধটিতে ভাষার বৈচিত্র্য সহজেই বোধগম্য হবে। দ্বিতীয়তঃ কিভাবে একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীগত, অবস্থানগত, জীবিকাগত, অর্থনীতিগত বৈষম্যে ভাষা প্রতি নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে-সে বিষয়েও জানা যাবে। সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ-সর্বাংশেই উপভাষাগত বৈচিত্র্যতা বর্তমান। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাভাষার কথ্য উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের স্বরূপ বৈচিত্র্যময়তাই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

ভাষাবিজ্ঞানের উপাদান, মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে নিঃসৃত, নিয়ত পরিবর্তনশীল ভাষা। ভাষা হল আত্মিক ভাববিনিময়ের সেই শক্তি, যার মাধ্যমে সমাজ মানুষটির নির্দিষ্ট অবস্থান-পরিচয় চিহ্নিত হয়। সামাজিক অবস্থানের সমান্তরালে সহজেই

একজন মানুষের ব্যবহৃত ভাষার মানদণ্ডে শিক্ষা-পেশা, আর্থিক-মানবিক, ধর্মীয়, লিঙ্গজাত পরিচয়ও সুস্পষ্টরূপে যাচাই করা যায়। ভাষাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মননের, চিন্তা-চেতনার সার্বিক সেতুবন্ধন করে; তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে মানুষের মৌখিক ভাষার গুরুত্ব-তাৎপর্যতা অপরিসীম। কারণ—

১। মৌখিক ভাষা ধ্রুবরাশি নয়; স্থান-কাল, সময়-অবস্থান ভেদে পরিবর্তনশীল।
২। এ ভাষা বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, শিক্ষা ভেদে পরিবর্তনশীল।
৩। সামাজিক-আর্থিক-পরিবেশগত চ্যুতি ঘটলে মৌখিক ভাষা একই মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে যায়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এই সত্যতা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু, বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্র ত্রিপুরা দক্ষিণাঞ্চল, তাই শুধুমাত্র দক্ষিণ ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময়তার প্রতিই আলোকপাত করা হবে।

সমগ্র ত্রিপুরার মানচিত্রে দেখা যায় যে, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া জেলার প্রায় সর্বাংশ, সাব্রুম-এর অধিকাংশ মানুষের মৌখিক উপভাষা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় ব্যবহৃত বাংলাভাষার সমসাদৃশ্য। তবে বিলোনীয়ার উত্তরে অবস্থিত উদয়পুর জেলায় ও অমরপুরের দক্ষিণেও নোয়াখালি উপভাষা দেখা যায়। তবে এই দুই স্থানে নোয়াখালি উপভাষার ব্যবহার তুলনামূলক অনেক কম। এছাড়া, বিলোনীয়া জেলার উত্তরপূর্বের কিছু স্থানে ও দক্ষিণে এবং সাব্রুম এর পূর্বে কিছুটা চট্টগ্রামী উপভাষা অঞ্চলও রয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে—

১। বিলোনীয়া এর দক্ষিণে ও সাব্রুমের পশ্চিমে রয়েছে ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালি, সন্দ্বীপ, হাতিয়া এবং সাব্রুমের দক্ষিণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার- যেগুলি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত এবং যেগুলি বর্তমানে যথাক্রমে নোয়াখালি উপভাষা অঞ্চল এবং চট্টগ্রামী উপভাষা অঞ্চল।
২। ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণে বলা যায় যে, একটি ভাষার উপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক ইত্যাদি একাধিক কারণে ভাষার পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটে।

তাই দক্ষিণ ত্রিপুরায়, কথ্য বাংলা ভাষার একাধিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যতা দেখা যায়; লেখ্য-ভাষায় মান্যভাষা সংরক্ষিত হলেও, সেখানেও চলে আসে মৌখিক আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব। বিষয়টি এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক; তাই শুধুমাত্র মৌখিক ভাষার প্রতিই আলোকপাত করা হল। সমাজভাষা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণে, ক্ষেত্রসমীক্ষার নমুনা অনুসন্ধানে যে সকল সংগঠনরীতির সূচক স্থির করে গবেষণাকর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; সেগুলি হল বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থান (পেশা/জীবিকা), পারিবারিক জীবিকা, শিক্ষা, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান, শহুরে-গ্রাম্য অবস্থান ইত্যাদি।
ক্ষেত্রসমীক্ষার পর দেখা যাচ্ছে যে—

প্রথমত : ত্রিপুরার দক্ষিণে, সমউপভাষা কেন্দ্রিক অঞ্চলে বসবাস করেও বয়স অনুযায়ী ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সমাজে কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থান, তার মৌখিক ভাষাকে পরিবর্তিত করেছে। একই ব্যক্তি জীবিকা ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করছে, পারিবারিক ক্ষেত্রে তা নয়। আবার, পারিবারিক জীবিকা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাভেদে বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোন ব্যক্তির গ্রাম-শহরে জীবিকা বা পেশার অবস্থান ভেদে তার মৌখিক ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে। আবার, পেশাক্ষেত্রে বয়স ভেদেও, অভিজ্ঞতা ভেদেও, শিক্ষাভেদেও, সংস্কৃতি ভেদেও মৌখিক ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : শিক্ষা মৌখিক ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কারণ, দক্ষিণ ত্রিপুরার একটা বৃহৎ অংশ পারিবারিক অবস্থান পরিবর্তন করেছে- স্বরাজ্যে ও বর্হিরাজ্যে। ফলে, মৌখিক ভাষায় যথেষ্ট মান্যভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। এই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা অর্ধশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তির মৌখিক ভাষায়ও প্রভাব এসেছে। আবার দেখা যাচ্ছ, কোন ব্যক্তি একাধিক শিক্ষিত মানুষের পরিমণ্ডলে যে ভাষা ব্যবহার করছেন, তা তুলনামূলক কমশিক্ষিত নিজস্ব পারিবারিক পরিমণ্ডলে

ব্যবহার করছেন না। সেখানে স্বঅবস্থানে ব্যবহৃত মৌখিক, অধিক প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মৌখিক ভাষায় তাই যথেষ্ট সচেতনশীলতা লক্ষণীয়। যথেষ্ট পরিবর্তিত এই ভাষা।

চতুর্থত : লিঙ্গ ভেদে ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা পরিবর্তনশীল। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রবিশেষে মৌখিক আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য ঘটেছে। আবার এই নারী বা পুরুষ যখন পারিবারিক পরিমণ্ডলে রয়েছে, তখন তার শিশু, বয়ঃজ্যেষ্ঠ, পরিবারের তৎপেক্ষা অশিক্ষিত ও মানুষ, সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে; যখন কর্মক্ষেত্রে রয়েছে তখন উর্ধ্ব, নিম্ন সহকর্মীর সাথে বাক্‌ব্যবহারের ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্যতা লক্ষ্য করা গেছে।

পঞ্চমত : শহরে ও গ্রামকেন্দ্রিক সামাজিক-পারিবারিক জীবন ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় বসবাসকারী দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষের মৌখিক ভাষা যথেষ্ট ভিন্ন, দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রত্যন্তে বসবাসকারী কোন ব্যক্তির তুলনায়। অনেক বেশী মান্যভাষার প্রতি সচেতনা গড়ে উঠেছে। তৎসঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারকারী মানুষের সংস্পর্শে ভাষার আদান প্রদানও ঘটেছে। অনেক বেশী নিজস্ব আঞ্চলিক মৌখিক উপভাষা অরক্ষিত থাকছে। আবার, দীর্ঘ বৎসর শহরে থাকার পর যখন পুনরায় দক্ষিণ ত্রিপুরায় নিজস্ব বাসভূমিতে যাচ্ছে, তখন ব্যবহৃত ভাষা পুনরায় মাতৃ অঞ্চলের অনুরূপ হচ্ছে। অর্থাৎ বাসস্থান ভিন্নতায় ভাষা ভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

উক্ত এই সকল কারণেই ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলের মৌখিক আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সাধারণত, নোয়াখালি উপভাষা ও চট্টগ্রামী উপভাষা ব্যবহারকারীর প্রাধান্যতা এখানে দেখা যায়। এখন এই দুই আঞ্চলিক উপভাষা কীরূপে পরিবর্তিত হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত নোয়াখালি উপভাষার বর্তমান প্রয়োগরূপের প্রতি আলোকপাত : আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাধান্যতা দেখা যায় মৌখিক আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। যেমন—'কুরিগুলা' অর্থাৎ মুরগিগুলো অর্থে ব্যবহৃত, 'ক্যোঁরা' অর্থাৎ কাঁকড়া অর্থে যেমন প্রয়োজ্য, তেমন কেন্নোজাতীয় সরীসৃপ অর্থেও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। 'হিঁইয়া দিয়া' অর্থাৎ গেঁথে তোলা অর্থে, 'ক্যাঁতা' অর্থাৎ গায়ে দেওয়ার কাথা অর্থে, 'ফুঁতি' অর্থাৎ বই অর্থে, 'ফির' অর্থাৎ পশ্চাৎফেরা অর্থে যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, তেমন তুঁই, তুঁইয়া, তুঁমার- মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রেও আনুনাসিক প্রয়োগবিধি লক্ষ্যণীয়। কথ্য আঞ্চলিক উপভাষায় 'অ' ধ্বনি সংরক্ষিত থাকলেও, কখনও অ>ও, ই>উ, উ>ও-তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মশা (Mosquito)>মোশা, কল> কোল, বল> বোল, ইত্যাদি। বালি> বালু, থালি> থালু, ইঁদুর> উন্দুর বা উঁন্দুর ইত্যাদি; জুতা> জোতা, বুক> বোক ইত্যাদি। নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ভাষাকে বিস্তর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.রবীন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়, তাঁর "নোয়াখালি চট্টগ্রামের উপভাষা, একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" গ্রন্থের ৪৭-তম পৃষ্ঠায় (মার্চ ২০১২, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ISBN : 978-81-8064-215-9) যে আকর্ষণীয় তথ্য দিয়েছেন, সে ভিত্তিতে বলা যায় যে, একমাত্রিকর দ্বিস্বরের সংখ্যা ২০, দ্বিমাত্রিক দ্বিস্বর ১৫টি, ত্রিস্বর ৩১টি চতুঃস্বর ১০টি, পঞ্চস্বর ১টি, ষট্‌স্বর ১টি। একাধিক যৌগিক স্বরের ব্যবহার বর্তমানে প্রয়োগক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। দক্ষিণ ত্রিপুরার বৃহত্তর অঞ্চলের মৌখিক ভাষার শব্দমধ্যে 'ঝ' ধ্বনি (ঘোষ, মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট) রক্ষিত রয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানের মৌখিক আঞ্চলিক ভাষায় 'চ' ও 'ছ' ধ্বনিটি মাঝে মাঝে 'স' ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন—'বাচ্ছা-কাচ্ছা' শব্দটি শীঘ্র উচ্চারণে হয়েছে 'বাস্‌সা-কাস্‌সা' ইত্যাদি। আবার, শব্দমধ্যে 'ওয়' অর্ধস্বরটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। যেমন- 'শোয়ামি', 'নোয়া' ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে, অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি 'গ' এবং মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি 'ঘ' এর উচ্চারণ প্রায় একই রকম। মৌখিক আঞ্চলিক উপভাষায় 'ফ' ধ্বনির পরিবর্তে উচ্চারিত হয় 'হ'। অর্থাৎ শুধুমাত্র মহাপ্রাণতা রক্ষিত থাকে। শব্দমধ্যে অবস্থিত 'গ' ধ্বনিটি উচ্চারণে কখনও বা লুপ্ত হয়েছে। তাই 'ছাগল' শব্দটি হয়েছে 'সাওল', 'ছাগলছানা' হয়েছে 'সাওলসানা', এবং 'ছাগলবাচ্ছা' হয়েছে 'সাওলবাস্‌সা'। শব্দ শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিতেও উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক বাংলা মৌখিক উপভাষায় অপিনিহিতির প্রাধান্যতা পেয়েছে। উচ্চারণকালে প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে অপিনিহিতির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- আজি>আইজ, কালি>কাইল, তেলিয়া>ত্যেইল্‌লা, মাটিয়াল>মাইট্‌টাল্‌, করিতে>কইত্‌তে,

কালিয়া>কাইল্‌লা, গাছুয়া>গাউচ্‌ছা ইত্যাদি। বিপর্যাস এর ফলে শব্দ মধ্যস্থ ধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনও মৌখিক বাক্যব্যবহারে উঠে এসেছে।

বর্তমানে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার নমুনা :

১। "আইজ আমার বইমেলাতে যাওয়ার কথা আছল।" (আন্দার মানিক গ্রাম, নোয়াখালি জেলা, বাংলাদেশ থেকে আগত, বর্তমানে সাব্রুম জেলায় বসবাসকারী শ্রীমান অরিজিৎ চক্রবর্তীর মৌখিক ভাষা)

২। "এরিও বড্ডাভাই, কুন ভাই গিছলা।" (নোয়াখালি জেলা, বাংলাদেশ থেকে আগত সাব্রুমে পিতৃগৃহ, কল্যানপুর খোয়াই-এ শ্বশুরগৃহে বসবাসকারী শেফালী বিশ্বাসের মৌখিক ভাষা)

৩। "আমি ভাই বানানি খাইয়া পেট ধুম হইয়া রইছে।" (নোয়াখালি বাংলাদেশ থেকে আগত শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরায় বসবাসকারী শ্রীতমাল দেবনাথের মৌখিক ভাষা)

৪। "আমি তোমারে কইসি না; আমরা চার-পাঁচ তারিখ আইমু।" (নোয়াখালি বাংলাদেশ থেকে আগত শান্তির বাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরায় বসবাসকারী রতন দেবনাথের মৌখিক ভাষা)

চট্টগ্রামী উপভাষার বর্তমান প্রয়োগরূপের প্রতি আলোকপাত: ত্রিপুরার দক্ষণাঞ্চলে বাংলা আঞ্চলিক উপভাষার ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আনুনাসিক স্বরধ্বনির বিপুল ব্যবহার। অনেকক্ষেত্রেই মৌখিক ভাষার উচ্চারণকালে শ্বাসাঘাত এমনভাবে শব্দের উপর পড়েছে, যেখানে অননুনাসিক স্বরধ্বনিও আনুনাসিক হয়েছে। যেমন- ভগ্ন করিয়া অর্থে 'ভাঁই' কিংবা 'বাঁই' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভ্রাতৃ অর্থে, 'ভাই' শব্দটিতে ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিটি ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে 'বাই'। এরকম আনুনাসিক স্বরধ্বনির দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে তাদের প্রয়োগিক আঞ্চলিক উপভাষায়। যেমন- 'বড়' অর্থে 'ডঁর', 'সিম' অর্থে 'ছুঁই'/ 'সই', নারকেলের গুচ্ছ অর্থে 'ফিঁর', বাছুর অর্থে 'ডেঁইয়া' ইত্যাদি প্রাত্যহিক শব্দ ব্যবহারে উঠে এসেছে। 'অ' স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে 'এ'-তে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বক্র : বেঁকা, বেঁয়া; 'ই' স্বরধ্বনি 'আ'-তে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে, খুঁটি>খুঁড়া। 'এ' ধ্বনিটি 'অ' কিংবা 'উ'-তে রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা> উগ্‌গা কিংবা উগ্‌গোয়া। 'উ' ধ্বনি 'ও'-তে উচ্চারিত হয়েছে।

জুতা : জোতা, 'ও' ধ্বনি 'অ'-তে উচ্চারিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায়। ছোট-ছড। ড. সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়, তাঁর 'বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন (১ম প্রকাশ, ১৯৭৫) : "মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ববঙ্গের ভাষায় যেখানে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনি-মিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণ বা কণ্ঠ নালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে ওঠে।" উক্ত বিষয়টির প্রায়োগিক রূপ প্রকাশ পায় ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলের মৌখিক উপভাষায়। যারা চট্টগ্রামী উপভাষা ব্যবহার করেন, তারা 'সে'> 'ইতে', 'হয়' > 'অয়' যেমন বলেন, তেমন যথাক্রমে 'ই' ও 'অ' স্বরধ্বনি দুটির উপর স্বরাঘাত দেয় ও 'হ' ধ্বনিটি লুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া উচ্ছারণকালে 'ঘ' ধ্বনির অনুপস্থিতি ও 'ঘ' এর স্থলে 'গ' ধ্বনির উচ্ছারণের নিদর্শন প্রচুর। বাঘ>বাগ, ঘর>গর। লোকমুখে উচ্চারণ কালে 'ঝ' ধ্বনিটি 'Z' (জ) এর মত শোনা যায়। শব্দের আদিতে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের উচ্চারণ শোনা যায় না। তবে মাঝে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন লভ্য। আবার, 'ক' ধ্বনির পরিবর্তে 'খ' ধ্বনির প্রয়োগও শোনা যায়। কত> খত, কাইল>খাইল, কদম>খদম ইত্যাদি। তালুদন্তমূলীয় উষ্ম-ঘৃষ্ট 'ছ' ধ্বনি উচ্চারণকালে কখনও বা উর্ধ্বদন্ত্য উষ্ম-ঘৃষ্ট 'স' হয়ে যায়। ছোটা>সোটা/সোডা, আছি>আসি, ছানা>সানা ইত্যাদি। কথ্য উপভাষায় বারংবার পদ মধ্যস্থিত দুটি ধ্বনি পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনও (বিপর্যাস) করেছে।

বর্তমানে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা নমুনা : চট্টগ্রাম

১। এইরকম পাইলে তুমি কইও আমারে। না! হাসতাসি তোমার খাওয়া দেইখ্যা। ফন খরল্যা ফন তোল না; আমরা খি এতই খারাপনি? (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে আগত সাব্রুমে, দক্ষিণ ত্রিপুরা বসবাসকারী শ্রীমান তাপস দেবনাথের মৌখিক ভাষা)

২। 'হিতে আঁরে মন্‌দ কয়' (চিটাগাং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে আগত সাব্রুমে বসবাসকারী মানস দেবনাথের মৌখিক ভাষা)

৩। "তুমি আবার কিতা সারভে কইর্‌ত্যা বাইরুইছো।" (চিটাগাং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে আগত বিলোনীয়ায় বসবাসকারী শ্রীমতি প্রতিমা দেব এর মৌখিক ভাষা)

৪। "গরিব্‌ মাইনশরে শাইজজ কইল্‌লে হুইন্‌ন অয়" (চিটাগাং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে আগত বিলোনীয়ায় বসবাসকারী প্রদীপ মল্ল-র মৌখিক ভাষা)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতি কুমার : বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, ১ম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫।

২। সেন, ড. সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, দ্বাদশ সং, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৭৫।

৩। দত্ত, ড. রবীন্দ্রকুমার, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উপভাষা একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১২।

৪। চৌধুরী, কুমুদ কুন্তু : ত্রিপুরার ভাষাচর্চা : বাংলা ও ককবরক, সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে ত্রিপুরার কথ্যবাংলার গতিপ্রকৃতি, অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬।

৫। সরকার, ড. পবিত্র , ভাষা, দেশ, কাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮।